ভয়াবহ নানা

বৃষ্টি আর সাগরের খুব মন খারাপ, আজ নানাবাড়ি থেকে একটা চিঠি এসেছে। সেই চিঠিতে লেখা—তাদের নানা রোজার শুরুতেই চলে আসবেন এবং ঈদ করে ফিরে যাবেন। যারা এই মানুষটাকে দেখেছে শুধু তারাই জানে এটা একটা মহা দুঃসংবাদ। চিঠিটা পেয়ে আব্বার মুখ শক্ত হয়ে গেল, আম্মা কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, কী মজা হবে না?

সাগরের বয়স আট। কখন কী বলতে হয় জানে না, সে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, না, একটুও মজা হবে না।

অন্য সময় হলে আব্বা আর আম্মা সাগরকে একটা শক্ত বকুনি দিতেন, আজকে কিছু বললেন না। আম্মা তার কথা না শোনার ভান করে বললেন, বয়স্ক মানুষ, এতদিন এখানে থাকবেন, কষ্ট হবে না তো?

আম্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাই বলে তো আমি আর আসতে না করতে পারি না। কাজেই রোজা শুরু হওয়ার আগেই বৃষ্টি আর সাগরের নানা চলে এলেন। তার বয়স সত্তরের ওপরে। একসময় মনে হয় লম্বা-চওড়া ছিলেন, এখন শুকনো কিশমিশের মতো কুঁকড়ে গেছেন। দাঁত পড়ে গিয়ে গাল ভেঙে গেছে, সামনে দেড়খানা দাঁত, একটা কথা বলার সময় নড়াচড়া করে। থুতনিতে ছাগলের মতো একটু দাড়ি এবং মাথায় টুপি। চোখ দুটি ছোট এবং কুটিল, ভুরু দুটি সবসময় কুঁচকে আছে, পৃথিবীর সবকিছুর ওপরে তিনি সবসময় বিরক্ত হয়ে আছেন।

বৃষ্টি আর সাগর যখন তাকে সালাম করতে গেল নানা তার কুটিল চোখ দুটিকে প্রায় বিষাক্ত করে ফেলে বললেন, বৃষ্টি না? এইটা কী পরে আছিস?

বৃষ্টির বয়স চৌদ্দ। সে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে আজকে তার প্রিয় জিন্সের প্যান্টের সাথে চলচলে একটা টি শার্ট পরে আছে। নিজের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই নানা বললেন, মেয়েলোকের সৌন্দর্য তার সাজপোশাকে না মেয়েলোকের সৌন্দর্য হচ্ছে, লাজ-শরমে। এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে এই রকম বেলেল্লাপনা—

বৃষ্টি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখল। সে অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে—এই লোকের সাথে কথা বলা আর বোলতার চাকে ঢিল মারা মোটামুটি এক ব্যাপার। নানা এরপর সাগরের দিকে তাকালেন এবং মুখ খিঁচিয়ে বললেন, আদব–কায়দা কিছু শিখিস নাই?

সাগর ঠিক বুঝতে পারল না কেন সে গালি খাচ্ছে, কিন্তু সে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না, দৌড়ে গিয়ে সালাম করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এরপর থেকে বাসায় মোটামুটি একটা নরকযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। সবচেয়ে প্রথম গান শোনা বন্ধ হল, ইংরেজি তো দূরের কথা বাংলা গানও শোনা যাবে না। গান–বাজনা নাকি শয়তানের জবান। তারপর বন্ধ হল টেলিভিশন। কেউ যদি টেলিভিশন দেখে তাহলে নাকি হাবিয়া দোজখেও তার জায়গা হবে না। তারপর বন্ধ হল গল্পের বই পড়া, বইয়ের নামগুলো দেখেই নানার চোখ উল্টে যাবার অবস্থা। এই সব বই পড়লে তারা নাকি পুরোপুরি উচ্ছন্নে যাবে। শুধু তাই না প্রতিদিন সন্ধেবেলা নানা একটা রুলার নিয়ে তাদের আরবি পড়াতে বসতে শুরু করলেন। বৃষ্টি আর সাগরকে সুর করে "আলিফ জবর আ নু জবর না কাফ মিম পেশ কুম আ–না–কুম" পড়া শুরু করতে হল। একটু ভুল হলেই ঠকাশ করে মাথার মাঝে রুলার দিয়ে একটা বাড়ি। এটাও হয়তো সহ্য করা যেত, কিন্তু একদিন খাবার টেবিলে অত্যন্ত কুৎসিত ভঙ্গিতে খেতে খেতে নানা ঘোষণা করলেন, বৃষ্টি আর সাগরের নাম ঠিক হয় নাই।

আম্মা ভয়ে ভয়ে বললেন, ঠিক হয় নাই?

না। হিন্দুয়ানি নাম।

আব্বা গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, হিন্দুয়ানি তো না এগুলো হচ্ছে বাংলা নাম।

নানা বীভৎস একটা ঢেকুর দিয়ে বললেন, এক কথা। এই নাম ঠিক করতে হবে।

বৃষ্টি আর সাগর কিছু বলল না, আম্মা শংকিত চোখে বললেন, কীভাবে ঠিক করবেন?

নূতন নাম দিতে হবে।

কেউ আর কোনো কথা বলল না। কিন্তু সন্ধে হবার আগেই বৃষ্টি আর সাগরের নূতন নাম দেয়া হল যথাক্রমে গুলবদন আর বিল্লাল। নাম শুনে বৃষ্টির প্রথমে মনে হল সে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে, তারপর মনে হল নানার টুঁটি চেপে ধরবে, কিন্তু সে কিছুই করল না। রাত্রে যখন ঘুমানোর জন্যে নিজের ঘরে হাজির হল থমথমে গলায় ঘোষণা করল, এই বাসায় হয় নানা থাকবে না হয় আমি থাকব।

সাগর ভয়ে ভয়ে বলল, কী করবে আপু?

এক সপ্তাহের মাঝে নানাকে এখান থেকে বিদায় করব। যদি না পারি—

সাগর চোখ বড় বড় করে বলল, যদি না পারি তাহলে কী?

তাহলে আমার নাম পাল্টে ফেলব।

কী নাম হবে?

বৃষ্টি এক সেকেন্ড চিন্তা করে বলল, গুলবদন!

বৃষ্টি সেদিন থেকেই কাজ শুরু করে দিল। নানাকে যদি এই বাড়ি থেকে দূর করতে হয় তাহলে এখানে তার জীবন অতিষ্ঠ করে দিতে হবে। একজন মানুষের জীবন অতিষ্ঠ

করার এক শ একটা উপায় রয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কিছু একটা করলেই নানা বুঝে ফেলবেন কাজটা কে করছে। তখন বিপদ না কমে মনে হয় আরো বেড়ে যাবে। কে জানে নানা তখন হয়তো তাকে একটা কাটমোল্লার সাথে বিয়ে দেয়ার কথা বলতে থাকবেন— কথাটা চিন্তা করেই বৃষ্টির সারা শরীর শিউরে ওঠে। নানার জীবন অতিষ্ঠ করে দিতে হবে এবং নানা যেন বুঝতে না পারেন সেটা কে করছে। নানার কাছে মনে হবে ব্যাপারটা এমনিতেই হচ্ছে কিংবা—

হঠাৎ বৃষ্টির মুখে হাসি ফুটে উঠল। নানার কাছে মনে হবে ব্যাপারটা করছে ভূতে! নানা হচ্ছেন কুসংস্কারের ডিপো। তার ধারণা পৃথিবীতে ভূতপ্রেত জিন পরী কিলবিল করছে, দোয়াদরুদ পড়ে কোনোভাবে মানুষজন সেখানে বেঁচে আছে। একটু উনিশ-বিশ হলেই কিছু একটা ঘটে যাবে আর জিন ভূত মানুষের ঘাড়ে চেপে বসবে। ঘুমানোর আগে নানা দোয়াদরুদ পড়ে বুকে ফুঁ দেন, হাততালি দেন, দেয়ালে থাবা দেন, তারপর বিকট স্বরে একবার চিৎকার দেন। তার ধারণা, সেই চিৎকার যতদূর থেকে শোনা যায় ততদূর কোনো ভূতপ্রেত আসে না! একজন মানুষ যদি ভূতপ্রেতকে এত গভীরভাবে বিশ্বাস করে তাকে ভূতের ভয় দেখানো কঠিন হবার কথা নয়। নানাকে কীভাবে ভূতের ভয় দেখানো যায় তার নানা ধরনের পরিকল্পনা বৃষ্টির মাথায় খেলতে থাকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার চোখে ঘুম আসতে চায় না।

পরদিন ভোরে নানার ঘরটা ভালো করে পরীক্ষা করে বৃষ্টি একটা জিনিস আবিষ্কার করল। সবগুলো ঘরের মাঝেই বৃষ্টির কিংবা অন্য ধরনের পানি বের করার জন্যে একটা ফুটো রয়েছে। নানার ঘরের ফুটোটাতে একটা নল লাগিয়ে সেই নলের আরেক মাথা যদি তারা তাদের নিজেদের ঘরে নিয়ে আসতে পারে তাহলে তারা সারা রাত একটু পর পর নানাকে বিভিন্ন রকম ভৌতিক আওয়াজ শোনাতে পারবে! যেহেতু তারা নিজেদের ঘরে ঘুমিয়ে থাকবে কিছুতেই তাদের সন্দেহ করবে না। বেশি বিপদ দেখলে টান দিয়ে নলটাকে টেনে নিজেদের ঘরে নিয়ে আসবে। কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না কেমন করে ব্যাপারটা ঘটেছে!

পরিকল্পনাটা কয়েকবার ভালো করে যাচাই করে বৃষ্টি বিকেলবেলা বের হল। মাকে বলল তার বন্ধু শাওনের বাসায় যাচ্ছে। বাসার কাছেই একটা লোহালক্কড় যন্ত্রপাতির দোকান আছে। কেউ দেখে ফেলবে বলে বৃষ্টি সেখানে গেল না। রিকশা করে বেশ খানিকটা দূরে একটা দোকানে গিয়ে প্রায় দশ গজ প্লাস্টিকের নল কিনল। অনেক সুন্দর সুন্দর রং ছিল; কিন্তু বৃষ্টি কিনল ম্যাটম্যাটে সাদা রঙের, যেন দেয়ালের সাথে মিশে থাকে। নলটা কিনতে গিয়ে অনেকগুলো টাকা বের হয়ে গেল। বইমেলায় বই কিনবে বলে টাকাগুলো বাঁচিয়ে রাখছিল। টাকাগুলো গুনে দিতে গিয়ে তার বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল! কিন্তু কী আর করবে!

বাসায় আসতে আসতে সন্ধে হয়ে গেল, প্লাস্টিকের নলটা আজ আর লাগাতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু রাত্রিবেলা একটা সুযোগ এসে গেল। বৃষ্টি আর সাগরের এক দূরসম্পর্কের মামা-মামি বেড়াতে এলেন। সবাই মিলে যখন বাইরের ঘরে বসে কথা বলছে তখন বৃষ্টি সাগরকে পাহারা রেখে বের হয়ে গেল। নলের এক মাথা নানার ঘরের ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে অন্য মাথা টেনে আনল নিজেদের ঘরে। বইয়ের সেলফের পিছনে দিয়ে খাটের পাশে দিয়ে একেবারে বিছানায়। সাগরকে প্লাস্টিকের নলে মুখ লাগিয়ে

একটু শব্দ করতে বলে বৃষ্টি নানার ঘরে গিয়ে হাজির হল—মনে হল নানার খাটের নিচে বসে সাগর শব্দ করছে!

রাতে নানার সব রকম যন্ত্রণা আজ বৃষ্টি আর সাগর মোটামুটি হাসিমুখে সহ্য করল। খেয়েদেয়ে দাত ব্রাশ করে তারা সময়মতো নিজেদের ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অন্যদিন হলে কিছুক্ষণের মাঝেই সাগর ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে যেত, আজ সে জেগে রইল। রাত গভীর হওয়ার পর যখন সবাই শুয়ে পড়ল তখন বৃষ্টি নলটাতে মুখ লাগিয়ে প্রথমে নাকী কান্নার মতো একটা শব্দ করল। খুব জোরে নয় খুব আস্তেও নয়। নানা যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে যেন জেগে ওঠেন সেভাবে। শব্দ শুনে কিছু হল বলে মনে হল না। তখন বৃষ্টি দ্বিতীয়বার নাকী কান্নার শব্দটি করল, আগের থেকে জোরে এবং হঠাৎ তারা শুনল পাশের ঘরে নানা ধড়মড় করে উঠে বসেছেন এবং ভয় পাওয়া গলায় বলছেন, কে? কে?

বৃষ্টি আর সাগর হাসি চেপে শুয়ে রইল। নানা বিছানা থেকে উঠলেন এবং লাইট জ্বালালেন। শব্দ শুনে মনে হল বিছানার নিচে উঁকি মারছেন। সেখানে কিছু না পেয়ে মনে হয় আবার বিছানায় গিয়ে বসেছেন। নলে কান লাগিয়ে বৃষ্টি নানার ঘরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। মনে হল নানা বিড়বিড় করে দোয়াদরুদ পড়ছেন।

বৃষ্টি আবার নলে মুখ লাগিয়ে শব্দ করল। এবারে নাকী কান্নার শব্দ নয় ক্রুদ্ধ কোনো মানুষের গলার স্বর—কেউ যেন খুব রেগে গিয়েছে সেরকম। সাথে সাথে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। নানা লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলেন। তারপর দরজা খুলে প্রায় দুদ্দাড় করে তাদের ঘরে ছুটে এলেন—বৃষ্টি আর সাগর বালিশে মাথা রেখে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে থাকার ভান করল। বৃষ্টি অন্ধকারে প্লাস্টিকের নলটি তার বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখল। হঠাৎ করে যদি নানার চোখে পড়ে যায় মনে হয় মহা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে!

নানা দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় ডাকলেন, গু–গু–গুলবদন।

বৃষ্টি হাসি চেপে শুয়ে রইল। নানা আবার ডাকলেন, গুল–গুল–গুলবদন। বিল্লাল।

দুজনের কেউ কিছু বলল না। নানা তখন ডাকলেন, বিষ্টি।

বৃষ্টি তখন ঘুম থেকে ওঠার ভান করে বলল, কে?

আমি। তোর নানা।

কী হয়েছে নানা?

লাইটটা একটু জ্বালাবি?

বৃষ্টি উঠে লাইট জ্বালাল এবং খুব অবাক হবার ভান করে বলল, কী হয়েছে?

তোরা কি কোনো শব্দ শুনছিস?

কিসের শব্দ?

এই মানে ইয়ে, মানে কেউ কাঁদছে—

বৃষ্টি হাই তোলার ভান করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে বলল, বিড়াল টিড়াল হবে।

নানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাতি নিভিয়ে দিয়ে আবার ভয়ে ভয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। বৃষ্টি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার নলটিতে মুখ লাগিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল এবং শুনতে পেল নানা চিৎকার করে দোয়াদরুদ পড়তে পড়তে লাফিয়ে ঘরের বাইরে এসে বসেছেন!

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বৃষ্টি আবিষ্কার করল নানা বারান্দায় একটা চেয়ারে গুটিসুটি

মেয়ে ঘুমিয়ে আছেন। রাত্রে তার নিজের ঘরে ঘুমানোর সাহস হয় নি। বৃষ্টি সাবধানে জানালা খুলে তার প্লাস্টিকের নলটি টেনে এনে পেঁচিয়ে ফেলে বিছানার নিচে লুকিয়ে ফেলল। দিনের বেলা সেটা কেউ দেখে ফেললে খুব বিপদ হয়ে যাবে।

নানা সারাদিন খুব মনমরা হয়ে রইলেন। রাত্রে যে ভয় পেয়েছেন সকালে সেটা কাউকে বলতে তার লজ্জা হল। আকারে-ইঙ্গিতে কয়েকবার মাকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলেন এই বাসায় কখনো ভূতের উপদ্রব হয়েছে কি না—মা হেসেই তার কথা উড়িয়ে দিলেন।

সেদিন বিকেলবেলা আকাশ কালো করে বৃষ্টি এল। বৃষ্টি ভেবেছিল তার নলটা আবার লাগাবে কিন্তু বাইরে যেতে সাহস পেল না। একটু আধটু ভিজতে তার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কেন ভিজেছে সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহা বিপদ হয়ে যেতে পারে। বৃষ্টির দিনে ভয় দেখানোতে একটা অন্য রকম মজা রয়েছে। কিন্তু নলটা লাগানো হয় নি বলে এখন আর কিছু করার নেই।

নানা অবশ্যি আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়েছেন। বৃষ্টি গিয়ে দেখে এসেছে মৃদু এবং অত্যন্ত বিচিত্র স্বরে তার নাক ডাকছে। জানালাগুলো সব বন্ধ করা হয় নি এবং ভিতরে একটু একটু বৃষ্টির ছাট আসছে—সেটা দেখে হঠাৎ করে বৃষ্টির মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে খাবার ঘরে ফ্রিজ খুলে একটা বরফের টুকরা নিয়ে এসে নানার মশারির উপরে রেখে দিল। কিছুক্ষণেই সেটা গলতে শুরু করে টপ টপ করে মুখের ওপর পানি পড়তে শুরু করবে।

বৃষ্টি নিজের ঘরে বসে শুনতে পেল হঠাৎ করে নানার নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গালিগালাজ করছেন। বৃষ্টি তারপর জানালা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল এবং বুঝতে পারল গজগজ করতে করতে নানা আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। বৃষ্টি কান পেতে রইল এবং শুনতে পেল কিছুক্ষণের মাঝেই নানা আবার বিছানা থেকে উঠেছেন এবং পুরো খাট টেনে সরানোর চেষ্টা করছেন।

পরবর্তী দশ থেকে পনের মিনিট নানা তার বিছানা টানাটানি করলেন এবং একসময়ে আম্মা উঠে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে বাবা?

নানা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, তোদের বাড়ির ছাদে ফুটো, বৃষ্টির পানিতে ঘর ভেসে যাচ্ছে।

আম্মা অবাক হয়ে বললেন, কী বলছেন আপনি? ছাদে কেন ফুটো হবে। নূতন বিল্ডিং—

নানা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, নূতন বিল্ডিং শেখাচ্ছিস আমাকে? এই দেখ বালিশ ভিজে কী হয়েছে।

আম্মা ভেজা বালিশ দেখে খুব অবাক হলেন। ততক্ষণে আব্বাও উঠে এসেছেন। ছাদ ভালো করে পরীক্ষা করা হল। কোথাও কোনো ফাটল বা পানির চিহ্ন নেই। বরফটা এতক্ষণে গলে শেষ হয়েছে তাই পানি আর পড়ছে না। আব্বা বললেন, বাইরে তো এখনো বৃষ্টি পড়ছে। আমরা তো কোনো পানি দেখছি না—

নানা আবার মুখ খিঁচিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। তারপর কাঁপা গলায় বললেন, সর্বনাশ!

আম্মা বললেন, কী হয়েছে?

কাল রাতের তারা নিশ্চয়ই এসেছে! পেশাব করে গেছে।

পেশাব? কারা পেশাব করেছে?

নানা বিড়বিড় করে দোয়া পড়তে পড়তে চি চি করে বললেন, রাত্রে এদের নাম নেয়া ঠিক না! এই বাড়িটার কিছু একটা দোষ আছে।

আব্বা এবং আম্মা নানার কথা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই ভুল করে পানি খেতে গিয়ে পানি ফেলেছেন—

নানা প্রতিবাদ করতে গিয়ে করলেন না। শুকনো মুখে একটা চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে রইলেন।

পরদিন বৃষ্টি স্কুল থেকে ফিরে এল মুখে একটা ঝলমলে হাসি নিয়ে। সাগরকে ঘরে ডেকে নিয়ে বলল, রাতে মজা দেখবি।

কী মজা আপু?

বৃষ্টি স্কুলব্যাগ থেকে একটা ছোট বোতল বের করে বলল, এই দ্যাখ।

এটা কী?

এর নাম এমোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড! গন্ধ শুঁকলে মাথা ফেটে যায়! রাত্রে নানার ঘরে একটা ডোজ দেব।

কেমন করে দেবে?

সময় হলেই দেখবি!

শুনে সাগরও একগাল হেসে ফেলল খুশিতে।

ঠিক সন্ধেবেলা বৃষ্টি আবার প্লাস্টিকের নলটা লাগিয়ে নিল। রাত্রিবেলা সবাই যখন শুয়েছে তখন বৃষ্টি নলটাতে শিশি থেকে এমোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইডটা ঢেলে দেয়। গড়িয়ে গড়িয়ে সেটা নানার ঘরে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগবে বলে সে আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে আছে। বড় একটা বেলুন ফুলিয়ে নলটার মাঝে লাগিয়ে নেয়। বেলুনের বাতাস তখন ঠেলে ঠেলে ঝাঁঝালো গন্ধের এমোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড নানার ঘরে পাচার করতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝেই নানা তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠেন এবং শব্দ শুনেই বৃষ্টি তার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ার ভান করতে থাকে।

নানা হাজির হলেন কিছুক্ষণের মাঝে। কাঁপা গলায় ডাকলেন, গু–গু–গুলবদন।

বৃষ্টি কোনো শব্দ করল না। নানা তখন ডাকল, বিষ্টি—

বৃষ্টি ঘুম থেকে ওঠার ভান করে বলল, কী হয়েছে নানা?

তো–তোর মাকে একটু ডেকে আনবি?

কেন নানা?

আ–আ–আমার ঘরে শুধু পেশাবের গন্ধ!

পেশাবের গন্ধ? কে পেশাব করেছে?

জানি না—তোর মাকে ডাক দেখি—

বৃষ্টি আম্মাকে আর আব্বাকে ডেকে আনল। তারা নানার ঘরে এসেই নাক কুঁচকে দাঁড়ালেন। সারা ঘরে সত্যিই এমোনিয়ার একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। যারা গন্ধটা চেনে না তাদের কাছে পেশাবের গন্ধ মনে হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আব্বা চিন্তিত মুখে নানার দিকে

তাকালেন। বললেন, আপনার ব্লাডার ঠিক আছে তো?

নানা চোখ পাকিয়ে বললেন, কী বলছ বাবাজী?

আব্বা ইতস্তত করে বললেন, সত্যিই এই ঘরে পেশাবের গন্ধ। আপনি ছাড়া তো আর কেউ থাকে না এই ঘরে। কাজেই বলছিলাম—

কী বলছিলে?

না, মানে, মানুষের যখন বয়স হয়ে যায় তখন নিজের শরীরের ওপরে কন্ট্রোল থাকে না। অনেক সময় ব্লাডার ফাংশান—

নানা বিস্ফারিত চোখে আব্বার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আব্বা বললেন, কাল আপনাকে একজন স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যাব—

নানা থমথমে মুখে বললেন, চিকিৎসা আমার লাগবে না। চিকিৎসা লাগবে এই ঘরের। এই ঘরে দোষ আছে। আমি জানি—

আব্বা কিছু বললেন না। ছোট বাচ্চারা অর্থহীন কথা বললে বড়রা যেভাবে মাথা নাড়ে সেভাবে মাথা নাড়লেন।

নানা সারারাত তার ঘরে লাইট জ্বালিয়ে বসে রইলেন।

পরদিন নানার মেজাজ হল খুব তিরিক্ষে। সকালে এমনি এমনি সাগরকে খুব খারাপভাবে গালিগালাজ করলেন। বৃষ্টিকে দেখেই তার মেজাজ খারাপ হতে লাগল এবং আজকালকার মেয়েরা যে কী রকম বেপরদা এবং বেহায়া সেটা নিয়ে বিশাল একটা লেকচার দিলেন। দুপুরের দিকে কোনো কারণ ছাড়াই কাজের ছেলেটার কান ধরে এত জোরে একটা চড় মারলেন যে তার নাক দিয়ে রক্ত বের হয়ে এল। সেটা দেখে আম্মাও একটু রেগে গিয়ে বললেন, বাবা, আমরা এই বাসায় কারো গায়ে হাত তুলি না।

নানা তখন ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—আমাকে শেখাচ্ছিস কার সাথে কী করতে হবে? ছোটলোকের জাতকে যে আমি জুতো দিয়ে পিটিয়ে তাদের পিঠের চামড়া তুলে ফেলি নি সেটা তাদের বাপের ভাগ্য—

মানুষ যে এ রকম অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে পারে নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না। বৃষ্টি নিজের ঘরে এসে সাগরকে বলল, আর সহ্য করা যায় না।

কী করবে আপু?

ফাইনাল ভয় দেখাব আজকে।

কীভাবে?

দুটো মুখোশ কিনে এনেছি। মুখে লাগিয়ে যাব মাঝরাতে।

সত্যি?

হ্যাঁ, তুই থাকবি এক জানালায়। আমি এক জানালায়। তারপর যেই আমাদের দিকে তাকাবেন হাত নেড়ে একবার শব্দ করব, বারটা বেজে যাবে!

যদি ধরা পড়ে যাই?

ধরা পড়লে পড়ব। আর কিছু করার নেই। এই মানুষকে আর সহ্য করা যাবে না।

মাঝরাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন বৃষ্টি আর সাগর দুজনে দুটো মুখোশ পরে নিল। বাসার সামনে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছে। দিনের বেলা সেটাকে এমন কিছু

আহামরি মনে হয় নি। কিন্তু রাত্রিবেলা সেটাকে ভয়ংকর দেখাতে থাকে—একজন আরেকজনকে দেখে ভয় পেয়ে যায় এবং সাগর হঠাৎ বৃষ্টিকে দেখে নিজের অজান্তেই একটা ছোট চিৎকার দিয়ে ফেলে। সাথে সাথে পাশের ঘর থেকে নানা গলা উঁচিয়ে বললেন, কী হয়েছে?

বৃষ্টি আর সাগর একেবারে সিটিয়ে গেল। কী করবে বুঝতে না পেরে দুজনে প্রায় দৌড়ে গিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে ঢুকল। এখন ধরা পড়ে গেলে একেবারে ভয়ংকর বিপদ হয়ে যাবে।

নানা পাশের ঘর থেকে আবার বললেন, কী হল?

বৃষ্টি আর সাগর কিছু বলল না। শুনতে পেল নানা তাদের ঘরের দিকে ছুটে আসছেন। বৃষ্টি মুখোশটা খুলে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সে মুখ ঢেকে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

নানা এতক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছেন। ঘরের লাইট কোথায় থাকে এতদিনে জেনে গেছেন। এসে হাত দিয়ে লাইটটা জ্বালালেন এবং সাথে সাথে একেবারে জমে গেলেন। সাগর মুখোশ নিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে সেটা মুখে লাগিয়েই বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। তাকে দেখাচ্ছে একটা সাক্ষাৎ শয়তানের বাচ্চার মতো। নানা হঠাৎ বিকট চিৎকার করে বৃষ্টির বিছানার দিকে ছুটে এলেন। ভয়ে আতঙ্কে কী করবেন বুঝতে না পেরে বৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরে আবার সেই ভয়াবহ চিৎকার করে উঠলেন। বৃষ্টি ঘুরে তার দিকে তাকাল, তখনো তার মুখে লাগানো রয়েছে বীভৎস একটা মুখোশ। হিংস্র কুটিল একজোড়া চোখের নিচে থ্যাবড়া নাক এবং অসুস্থ হলুদ রঙের মুখ। বীভৎস একপাটি দাঁত লোলুপ মুখের দুপাশে বের হয়ে আছে!

নানা এবারে রক্ত শীতল করা একটা চিৎকার করে বৃষ্টিকে ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলেন। দরজার চৌকাঠে তার পা বেঁধে গেল এবং তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং হঠাৎ করে তার সাড়াশব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

বৃষ্টি আর সাগর ধরে নিয়েছিল পুরো ব্যাপারটির কারণে তাদের কপালে বড় ধরনের দুঃখ রয়েছে। কিন্তু দেখা গেল ঘটনাটি একেবারে অন্যভাবে মোড় নিল। নানা জ্ঞান ফিরে পাবার পর থেকে বলতে লাগল বৃষ্টি আর সাগরকে জিনে পেয়েছে এবং তিনি নিজের চোখে দেখেছেন তাদের চেহারা পাল্টে পশুর মতো হয়ে গেছে। ডাক্তার কিংবা আব্বা-আম্মা কেউ তার কথা বিশ্বাস করল না। তাদের ধারণা হল কিডনি ঠিক করে কাজ করছে না বলে শরীরে ইউরিয়া জমা হয়ে তার মানসিক বিভ্রান্তি হচ্ছে।

তাকে কয়েকদিন নার্সিং হোমে রাখা হল। তারপর তাকে আবার বাসায় আনার কথা ছিল, কিন্তু নানা রাজি হলেন না। নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন।

বৃষ্টি আর সাগরকে জিনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য নানা তার পীরের কাছ থেকে একজোড়া তাবিজ পাঠিয়েছেন। বিশাল তাবিজ দেখে মনে হয় ছোটখাটো একটা ড্রাম! বৃষ্টি তাবিজটি তুলে রেখেছে। নানা যদি আবার কোনোদিন আসেন গলায় ঝুলিয়ে তার সামনে হাঁটাহাঁটি করতে হবে! তারপর ওই তাবিজ দিয়েই তাকে দারুণ একটা ভয় দেখানো যাবে। বৃষ্টি এখন থেকেই তার খুঁটিনাটি ঠিক করতে শুরু করেছে।